**Pratidhwani the Echo**
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
**ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)**
**Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.54-59
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

# উনিশ শতকে প্রথম নারীর কলমে নারীর আত্মজীবনী : প্রসঙ্গ রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'

**পীরুপদ মালিক**
*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

**Abstract:**
*Rassundari Dasi( 1809-1899) is a Bengali author who is marked as the first writer of a full-grown autobiography in her language. Before Rassundari, notable Bengali writers like Krittibas Ojha, Mukunda Chakraborty, Rupram Chakraborty wrote about the story of their lives but none of them could compose a perfect autobiography. Rassundari Dasi was the first to do it in Bengali literature. Ámar Jiban' by Rassundari Dasi was first published in 1876, 8 years after the death of her husband. She could free herself from the cage where she suffered humiliation in a society dominated by men. She could move forward only for her indomitable urge and desire. She wrote the first part of the book at the age of sixty and it was published when she was sixty seven. In the first part, there are sixteen chapters that are full of the various experiences of her life. The second part consists mainly of prayers to God. The second edition of this book was published when the author was eighty eight. This book shows the efforts of women to come out of imprisonment in a nineteenth century society. When we read the book we can find out the accounts of life of a self confident woman. The book is not merely relevant to the contemporary Bengali literature; it has become an important topic of discussion on the education of women afterwards.*

***Key Words: Russundari Dasi, Amar Jiban, Autobiography, Nineteenth Century, Self-confident.***

রাসসুন্দরী দাসী একজন বাঙালি লেখক যিনি প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীর লেখক হিসেবে চিহ্নিত। কারণ এর আগে যাঁরা আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃত্তিবাস ওঝা, মুকুন্দ চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী। এঁনারা কেউই পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী রচনা করেন নি। বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা রাসসুন্দরী দাসী। তাঁর জন্ম ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে বাংলা-র অন্তর্গত পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। তিনি 'আমার জীবন'-এর 'প্রথম রচনা'-তে লিখেছেন – "১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।"[১] পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। মাতার নাম তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি। তবে প্রথমে তিনি পিতার নামও জানতেন না। চার বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন।

খুড়োর কাছে প্রথম পিতার নাম শুনে পিসিমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর মা ও আত্মীয়দের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

রাসসুন্দরীর শৈশব শিক্ষা আরম্ভ হয় গ্রামের পাঠশালাতেই। তখন তাঁর বয়স আট। রান্নাবাটি, পুতুলখেলা আর দুষ্টু মেয়েদের হাত এড়িয়ে তাঁদের বারবাড়ির স্কুলে অভিভাবকেরা কন্যাটিকে পাঠিয়ে ঔদার্যেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। রাসসুন্দরীকে বাড়ির 'বাঙ্গলা স্কুল'-এ পাঠানো হয়েছিল। আসলে সে স্কুলটি ছিল ছেলেদের। তাঁকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য স্কুলে পাঠানো হয় নি, বসিয়ে রাখাটাই লক্ষ্য ছিল- "আমার খুড়া আমাকে কাল রঙের একটা ঘাগরা পরাইয়া একখানা উড়ানী গায়ে দিয়া সেই স্কুলে মেমসাহেবের কাছে বসাইয়া রাখিলেন। আমাকে যেখানে বসাইয়া রাখিতেন, আমি সেইখানেই বসিয়া থাকিতাম। ভয়ে আমি কোন দিকে নড়িতাম না। ...আমি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। এজন্য আমার সঙ্গে কেহ বড় কথা কহিত না; আমি সকল দিবস সেই স্কুলেই থাকিতাম।"[২] সে সময়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটাই ছিল না। 'মেয়েছেলে' লেখাপড়া শিখবে- সংসার যে রসাতলে যাবে! 'নেকাপড়া' শিখলে সে যে অচিরে বিধবা হবে, সন্তানবতী হলে স্তনের দুধ শুকিয়ে যাবে, অমঙ্গলে সংসার পূর্ণ হয়ে উঠবে! এই সব সামাজিক বিধান প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে সে পড়াশোনাটা শিখেছে কিন্তু কাউকে জানতে দেন নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথা স্মরণ করা যেতে পারে – "লেখাপড়া শিখিব বলিয়া সতত ব্যাকুল থাকে। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যখন আমি ছেলেবেলায় স্কুলে বসিয়া থাকিতাম, তখন যত ছাত্র লেখাপড়া করিত, আমিতো তাহা শুনিতে শুনিতে কতক কতক মনে মনে শিখিয়াছিলাম, তাহার কিছুই কি আমার স্মরণ নাই? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে ঐ চৌত্রিশ অক্ষর, ফলা বানান সহিত আমার মনে হইল। তাহাও কেবল পড়িতে পারি, লিখিতে পারি না। কি করিব, ভাবিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ একজন না শিখাইলে, কেহ লেখাপড়া শিখিতে পারে না।"[৩] তারপর তাঁর ছেলের তালপাতার পুঁথি দেখে নিজের মনের কোণে লালিত অক্ষরগুলো নিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে নিজে নিজেই পড়তে শিখেছিলেন। এভাবেই একদিন নিজের চেষ্টায় 'আমি অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে এবং অনেক কষ্ট করিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি গোঙ্গাইয়া পড়িতে শিখিলাম'।

চৈতন্যভাগবতের পুঁথিও রাসসুন্দরীর মধ্যে একটা বিপ্লব এনে দিল। দ্বিতীয়বার পড়া শিখেছিলেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। এমনভাবে বিশ্বে আর কেউ লেখাপড়া শিখেছিলেন কিনা জানি না, তবে রাসসুন্দরীর এই ইচ্ছে, ধৈর্য্য, প্রতিভা এবং অর্জন আমাদের কাছে সত্যিই বিস্ময়ের। তাঁর পড়ার প্রতি এতো আগ্রহ ছিল যে, ছাপার অক্ষরে সাতকাণ্ড রামায়ণ পেয়ে মহাখুশি হয়েছিলেন, আবার অক্ষর ছোটো ছিল বলে পড়তে না পারায় কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন। যাইহোক ষাট বছর বয়সে অত্যন্ত ঝরঝরে, সহজ, সাবলীল এবং সতেজ গদ্যে লিখে ফেললেন বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মজীবনী 'আমার জীবন'। তাঁর এই আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে উনিশ শতকের নারীর আত্মজাগরণের সুর। সুতপা ভট্টাচার্য এর কথায় – "রাসসুন্দরী রচিত সেই প্রথম আত্মজীবনী প্রকৃত অর্থেই 'আত্ম'-র জীবনী।...সামাজিকভাবে যে মেয়ে অচ্ছুত, ক্ষমতাহীন, সে তো আত্মকাহিনির মাধ্যমেই নিজের ব্যক্তিগত স্বর উপস্থাপিত করতে পারে, ক্ষমতাহীনের আত্মতাও কিছু সামান্য নয়- সে কথা জানিয়ে দিতে পারে... এই প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী নিছক একটা গল্প না হয়ে যথার্থভাবে আত্ম-র কাহিনি হয়ে উঠেছে।"[৪]

রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে, স্বামীর মৃত্যুর আট বছর পরে। পুরুষতান্ত্রিক লাঞ্ছিত জীবনের খাঁচা ভেঙে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। মনের অদম্য

জেদ আর মনের সুপ্ত ইচ্ছেতে ভর করে এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কারন তিনি সচেতনভাবে হিন্দু বিবাহ প্রথাকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। ‘বিবাহ’ সম্পর্কে লেখকের ধারণা- “লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই।”[৫] এই কথা শুনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে, সামাজিক প্রথাগুলিকে তো তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন। যদিও তিনি সবসময় প্রথাকে অস্বীকার করতে পারেন নি বা ভাঙ্গতে চান নি হয়তো, সেইজন্যই তিনি গ্রন্থটি প্রকাশের সময় নিজের নামে ‘দেবী’র পরিবর্তে ‘দাসী’ করে দিলেন।

বইটির প্রথম ভাগ লিখেছেন ষাট বছর বয়সে, প্রকাশিত হয়েছিল সাতষট্টি বছর বয়সে। প্রথম ভাগে আছে ষোলোটি রচনা; যেখানে প্রধানত জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথায় পূর্ণ। আর দ্বিতীয় ভাগে আছে প্রধানত ভগবত বন্দনা। এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যখন তখন রাসসুন্দরীর বয়স অষ্টআশি। প্রকাশ করেন পুত্র সরসীলাল সরকার। আর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। যদিও তিনি নিজে এই তৃতীয় সংস্করণ দেখে যেতে পারেন নি। রাসসুন্দরী এই গ্রন্থটির শেষে লিখলেন, “এই বইখানি আমার নিজ হস্তের লেখা। আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না। অধিকারী মহাশয়েরা, তোমরা যেন অবহেলা না কর, দেখিয়া ঘৃণা করিও না অধিক লেখা বাহুল্য।”[৬] এই জীবনকথা ৮৮ বছরে লিখছেন মানে জীবনের একেবারে অন্তিমলগ্নে এসে প্রায় সারাজীবন ধরে একটু একটু করে তাঁর যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি যে এক ব্যতিক্রমী মনবীর – সেটা যেন আমাদের মনে করিয়ে দিলেন তিনি।

উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের কারারুদ্ধ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাটা দেখানো হয়েছে। সে সময়ে তাঁদের লেখাতে দেখা যায় যে নিপীড়িত গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের প্রান্তিক অবস্থান সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন। এই সচেতনতা থেকেই পুরুষের নির্দেশিত পথে যাত্রা শুরু করলেও আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মানবিক অধিকার লাভ করার জন্যই এঁরা নিজেদের মতো করে লড়াই করে গেছেন। সেই সময় পরিবারের অন্তঃপুরের নিয়ম খুবই কঠোর ছিল। তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই। দিনের বেলায় স্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন না, অথবা তিনিও পারতেন না স্বামীর সামনে যেতে। স্বামী দিনের বেলা তাঁর সঙ্গে কথাও বলতে পারতেন না। বাড়ির ভেতরে কোনো পুরুষকে আসতে হলে সেকালে গলা খাকারি দিয়ে অর্থাৎ যথেষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে যাতে মেয়েরা অন্যত্র সরে যেতে পারেন অথবা কাপড় চোপড় দিয়ে সামলে ভদ্র হতে পারেন। একবার অসুস্থ রাসসুন্দরী দাসী প্রায় মারা যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে তাঁর স্বামী গায়ের তাপ অথবা শরীরের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করেন নি। বরং দূর থেকে ‘মলো নাকি!’ বলে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মাত্র। আসলে কৌলীন্য, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ – উনিশ শতকে প্রচলিত এ সমস্ত অনাচার দ্বারা বাঙালি সমাজ পূর্ণ ছিল। নারীরা সে সময় এর দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুতপা ভট্টাচার্য বলেছেন –“মেয়েদের কী কী করা উচিত, কী অনুচিত এসব আলোচনা নিয়ে অধিকাংশ লেখালিখি। এসব লেখা পুরুষের মকশো করে দেওয়া, এমন কথা বলেনি কেউ, অথচ পুরুষের শেখানো বুলিই আউড়ে গেছেন সেসব লেখার লেখিকারা। তাই দেখা যায়, স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এত যে লিখেছেন মেয়েরা, তার অধিকাংশ লেখাতেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে দেখা হয়েছে ভূমিকাপালনের দিক থেকেই। ভালো মা হওয়া, ভালো গৃহিণী হওয়া, কখনো বা ভালো স্ত্রী হওয়াকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন সেসব লেখিকারা।”[৭]

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের উত্থানে জাতীয়তা রক্ষার দায়টাও একইসঙ্গে মেয়েদের উপরেই বর্তেছিল। রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন' গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "এই জীবনখানি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। ইহা প্রাচীন হিন্দু রমণীর একটি খাঁটি নক্সা। যিনি নিজের কথা সরলভাবে কহিয়া থাকেন, তিনি অলক্ষিতভাবে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়া যান। 'আমার জীবন' পুস্তকখানি শুধু রাসসুন্দরীর কথা নহে, উহা সেকেলে হিন্দু রমণীগণের সকলের কথা; এই চিত্রের মত যথাযথ ও অকপট মহিলা-চিত্র আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। এখন মনে হয়, এই পুস্তকখানি লিখিত না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।"[৮] তাহলে নারীকে ঘর ও বাইরের, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, স্থায়িত্ব ও চাঞ্চল্য, আত্মিক ও জাগতিক প্রভৃতি দ্বৈধের দায়েই নারীকে নারী হিসেবে নির্মাণ করে তোলা হয়তো এত জরুরি ছিলো। আর তার জন্য প্রয়োজন সতীত্ব, পবিত্রতা, কোমলতা, লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মূল্যবোধ। পরিবর্তন মানেই উন্নতি নয় যেমন একথা ঠিক, তেমনি উনিশ শতকে নারীর মূল্যবোধের জাগরণ তো এভাবেই ঘটেছে। উনিশ শতকের মেয়েরা হিন্দু কুলকামিনী বা হেমাঙ্গিনী বা শতদলবাসিনী বা কুসুমকুমারী এঁনারা যে লিখেছেন সেই সময়ে, আমাদের মনে হয় না এঁদের কোনো খ্যাতি পাবার প্রত্যাশা ছিলো। কেনোনা তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়া করার ফলে যাতে গৃহকর্মে অমনোযোগী না হন মেয়েরা, সে বিষয়েও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন মেয়েরাই।

রাসসুন্দরী এই গ্রন্থেই আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন,'লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নেই।' অর্থাৎ যেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা না থাকার আক্ষেপ তীব্র ভাষাতে প্রকাশ পেয়েছে। বিবাহোত্তর জীবনকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি কিংবা শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর সঙ্গে তুলনা করে সেসব লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে নারীর ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে পুরুষের ভূমিকা প্রধান ছিলো। ধীরে ধীরে নারীরাও তাঁদের অধিকার অর্জনে তৎপর হন। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল তাঁদের মনোজগতে। ক্রমে মেয়েরা তাঁদের সংস্কার, জীবনচর্যা, মনের কথা, কামনা-বাসনার কথা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হলো। লেখার ধার যে সবক্ষেত্রেই সাবলীল ছিলো এমন নয়, তবু বহুক্ষেত্রে নতুন চিন্তা-চেতনা বিকশিতও হয়েছিল। স্বামীপুত্রহীন সপত্নী লাঞ্ছিত মেয়েদের বাঁচার অবলম্বন ছিলো বোধহয় কাব্যই। কিন্তু গদ্যসাহিত্যে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাসসুন্দরীর হাত ধরে। আত্মজীবনী লেখার ছলে তৎকালীন সামাজিক অসামঞ্জস্য বিধির বিরুদ্ধে স্পর্ধাবর্ণ উচ্চারিত হয়েছে এই গ্রন্থের পাতায়। রাসসুন্দরী মার্জিত বয়ানে উনিশ শতকের বাঙালি নারীর বিক্ষুব্ধ বয়ান লিখে গেলেন।

রাসসুন্দরী ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু ভাগ্যবাদী ছিলেন না। অথচ সেই কঠিন সময়ে জন্মগ্রহণ করেও রাসসুন্দরী দেবী সময়ের বিপ্রতীপে আশ্চর্যজনকভাবে হয়ে উঠেছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি যখন 'আমার জীবন' লিখছেন বাংলায় তখন আত্মজীবনী রচনার প্রচলন ছিলো না। সদ্য স্বয়ং শিক্ষিতা একজন প্রৌঢ়া, পাশ্চাত্য সাহিত্যও যে জানে না - সেই রাসসুন্দরীর হাত দিয়ে আত্মজীবনীর স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপ সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা গদ্য তখন বঙ্কিমযুগ পেরিয়ে এলেও স্বীকৃত হয় নি, সেইসময় নিজের জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির চল - সেই সময়ে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' একইসঙ্গে নতুন সাহিত্যরূপ সৃষ্টি ও বাঙালি পাঠককে সেই সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা দিয়েছিল, 'তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক।

এতকাল ইহা ছিল না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিন্‌সে জড়ভরত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখিব! এখন যেমত হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে'(পঞ্চম রচনা)। এমন নয় যে, জমিদারবাড়ির এক্কান্নবর্তী পরিবারে রাসসুন্দরীকে অবরোধ বাসিনীর জীবন যাপন করতে হতো। আবার পারিবারিক সামাজিকভাবে অত্যাচার অবহেলার নিত্য দিন যাপনও ছিল না। অথচ লেখাপড়া শেখা ও আত্মপ্রকাশের এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত ভীরু ও আত্মকেন্দ্রিক হয়েও নিজের কথা বলতে গিয়ে অকপট রচনা রাসসুন্দরী ও তাঁর রচনাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

রাসসুন্দরী যখন লেখেন – "আমি যেন এখন সে আমি নই, আমি যেন ভিন্ন আর একজন হইয়াছি; আমার মনের দুর্বলতা ঘুচিয়া কত বল এবং কত সাহস প্রাপ্তি হইল।" তখন আমরাও পেয়ে যাই আত্মপ্রত্যয়ী একজন নারীর ভাষ্য, যা শুধু সমকালীন সাহিত্যের নয় – হয়ে উঠবে পরবর্তীকালের মানবী বিদ্যাচর্চার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে রাসসুন্দরীর মানস বিবর্তনের রূপ রূপান্তর – যা থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী মনস্তত্ত্বকে। দ্বিতীয় ভাগে আছে পুরোটাই ভগবতবন্দনা। এই ভগবতপ্রেম বা ঈশ্বরবিশ্বাস আপাত ভীরু রাসসুন্দরীকে দিয়েছিল সাহস ও আত্মপ্রকাশের প্রত্যয়। 'আমার জীবন'-এর দুইভাগে রাসসুন্দরী তাঁর সমগ্র জীবনের ষাট বছর সময়-সীমা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, ইচ্ছে ছিল পরবর্তী জীবনকে তৃতীয় ভাগে ধরার – যদিও সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। পুনরাবৃত্তি বা ঈশ্বরস্তুতির অংশগুলি বাদ দিলে রাসসুন্দরীর রচনারীতি, চোদ্দ অক্ষরে পয়ারে পরিচ্ছেদের সূচনা ও সমগ্র গ্রন্থজুড়ে বস্তুনিষ্ঠা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একান্নবর্তী পরিবারের আটপৌরে গৃহবধূ হয়েও প্রগতিশীল – মনন, উদার দৃষ্টি ও আত্মবিশ্লেষণের জন্যে রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী হয়ে রইলো অনন্য আধুনিক। একজন নারীর মুখ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধ জুড়ে নারীর অবস্থান তার শিক্ষা-স্বাধীনতা, সংস্কার-কুসংস্কারকে জানার সুযোগ করে দিল রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন'।

মানব সংস্কৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যম ছিল কথা। কারণ তখনও ছাপার অক্ষরের সঙ্গে তারা পরিচিত হয়নি। তাই আত্মজীবনী লিখিয়ে বঙ্গমহিলাদের লেখার সহজ গল্পের সুরটি আমাদের অভিভূত করে দেয়। রাসসুন্দরী তাঁর সময়ে সামাজিক পারিবারিক প্রথা স্বীকার করে নিয়েই তাঁর চেতনার বোধ সমকালকে অন্য মাত্রা দান করেছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে শুধু স্মৃতিমেদুরতাই নয়, অবিভক্ত বঙ্গদেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, শৈশবের মুগ্ধতা সবই অনুষঙ্গ হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে। এই যে জীবন-যাপনের ইতিহাস সেখানে মেয়েদের পড়াশোনা শেখা শুধু পরিবারের প্রয়োজনে বা পুরুষের প্রয়োজনে। তাই রাসসুন্দরীর আত্মজীবনী পড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য যথার্থ – "লেখাপড়া শিখিবার তাঁহার কোন সুবিধা ঘটে নাই। তখনকার কালে স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখা দোষের মধ্যে গণ্য হইত। তিনি আপনার যত্নে, বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাহার ধর্মপিপাসাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে উত্তেজিত করে।...ইঁহার ধর্ম বাহ্যিক অনুষ্ঠান আড়ম্বরে পর্যবসিত নহে, ইঁহার ধর্ম জীবন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম। জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ইনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন; এক কথায় তিনি ঈশ্বরেতেই তন্ময়। এরূপ উন্নত ধর্মজীবন সচারচর দেখা যায় না। আমাদের দেশে ঈশ্বরের নামে যে বিগ্রহ স্থাপন করা হয়, তাহাকে ঠিক পৌত্তলিকতা বলা যায় না; তাহা ঈশ্বরের স্মারক চিহ্ন মাত্র। তাহাতে পৌত্তিলকতার সঙ্কীর্ণ ভাব নাই। খৃস্টানেরা হিন্দুকে যে ভাবে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, হিন্দুর পৌত্তলিকতা সে ভাবের নহে। লেখিকার জননী লেখিকাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে

উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতেই এই কথা প্রতিপন্ন হইবে।”[৯] রাসসুন্দরীর যন্ত্রণাগুলি এঁরা কেউই দেখলেন না। পুরুষের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে লিখনের মাধ্যমেই তাঁর নীরব প্রতিবাদ, অনুভব, স্বাদ পাঠককে নিশ্চয় ছুঁয়ে যায়। নারীদের স্মৃতিকথা নানাভাবে আমাদের ইতিহাস-জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। ব্যক্তিগত জীবন, একটি বিশেষ যুগ ও সেই যুগে নারীর অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে।

আত্মজীবনী রচনার কোনো আদর্শই যখন বাংলা সাহিত্যে ছিল না বা কোনো পুরুষ লেখকই তখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখেন নি বলেই রাসসুন্দরীর ‘আমার জীবন’ বাঙালি পাঠককে চমকে দেয় এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম নারীর কলমে আত্মজীবনী গ্রন্থ হিসাবে চিরকালীন আসন লাভ করে। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বাঙালি পাঠকের দরবারে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ার অভিজ্ঞতা অন্যরকম তো হবেই কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় দিনের পর দিন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-বিরহ, কামনা-বাসনা ইত্যাদি আত্মজীবনী ছাড়া অন্য নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং কোনো আত্মজীবনীর মধ্যে এগুলির প্রকাশের সফল প্রয়াস দেখা গেছে একজন নারীর কলমে। তাই সঙ্গত কারণেই রাসসুন্দরী দাসীর লেখা উনিশ শতকে নারীর কলমে প্রথম ‘আমার জীবন’ বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় আত্মজীবনী হয়ে থাকবে।

## সূত্র নির্দেশ:


১. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, রাসসুন্দরী দাসী ‘আমার জীবন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ. ৫।
২. তদেব, পৃ. ৮।
৩. তদেব, পৃ. ৩৫।
৪. সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েদের স্মৃতিকথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬১।
৫. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, রাসসুন্দরী দাসী ‘আমার জীবন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ. ২১।
৬. তদেব, পৃ. ১১০
৭. সুতপা ভট্টাচার্য সংকলন ও সম্পাদনা, বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ১০।
৮. দীনেশচন্দ্র সেন, গ্রন্থপরিচয় অংশ, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, রাসসুন্দরী দাসী ‘আমার জীবন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।
৯. শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রস্তাবনা অংশ, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, রাসসুন্দরী দাসী ‘আমার জীবন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।